সংবাদ

তারিখ ... JUL 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৪ ...

পাঠ্যসূচির সম্ভাব্য পরিবর্তন প্রসঙ্গে

রণেশ মৈত্র

বিগত বছরের (প্রকৃত পক্ষে বর্তমান বছরের) শিশু কিশোরদের স্কুলের পাঠ্যপুস্তকগুলোতে সুবোধ বালকের মতো আমাদের সরকার তাদের হাল আমলের পরম বন্ধু(!) হেফাজতে ইসলামের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী যে পরিবর্তন এনেছিলেন, কোন কোন মিডিয়ার খবরের কঠোর সমালোচনার কারণে আগামী শিক্ষাবর্ষের জন্য যে পাঠ্যবইগুলো ছাপানো হবে তাতে সংশোধনী আনতে যাচ্ছেন। যতটুকু জানা যায়, হেফাজতের নির্দেশে পাঠ্যসূচি বা পাঠ্যবইতে যে গল্প কবিতা প্রবন্ধগুলো বাদ দেয়া হয়েছিল ২০১৭ সালের পাঠ্যবইতে আগামী বছরের পাঠ্যবইগুলোতে সেগুলো পুনঃসংযোজন করতে যাচ্ছেন সরকার।

এছাড়া আর যে সংশোধনী আনার প্রস্তাব করা হয়েছে তাতেও ২০১৭ সালের বইতে যে অজস্র বানান ভুল ছিল এবার সেগুলোরও সংশোধন করে নির্ভুল বানান সংবলিত বই ছাপানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এইটুকু শুনলে গতবারের বিক্ষুব্ধ বিপুলসংখ্যক পাঠক-পাঠিকা নিশ্চয়ই আনন্দিত হবেন ভাববেন যা হোক, অবশেষে সরকার আমাদের দাবিতো মেনে নিলেন অর্থাৎ সবাই যেন এ খবরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবেন। আরও স্বস্তি পেতে পারেন এটা জেনে গতবারের বইতে 'ও' তে 'ওড়না চাই' লেখা হয়েছিল এবং এ জাতীয় আরও অনেক কিছু লেখা হয়েছিল যার বিরুদ্ধে দেশ-বিদেশে বাঙালি সমাজ তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত করেছিলেন এবার সেখানেও পরিবর্তন আনা হচ্ছে। পরিবর্তে লেখা হচ্ছে 'ও'তে 'ওজন'। এতে হয়তো আমরা খুশিতে আরও ডগমগ হয়ে উঠবো।

যদিও এবারের সম্ভাব্য পরিবর্তনগুলো সম্পর্কে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে জনগণকে এখনও স্পষ্টভাবে কিছুই জানানো হয়নি এবং সে কারণে আমাদের প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক বা অনলাইন মিডিয়াগুলোও তার বিস্তারিত তথ্য আজও প্রকাশ করতে পারেননি। তবে নানা অনুসন্ধানে যেটুকু এখন পর্যন্ত জেনেছি বা বুঝেছি তাতে এবারের নতুন পাঠ্যক্রমে সরকার গতবার যে সকল কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ প্রভৃতি বাদ দিয়েছিল সেগুলো সংযোজিত হতে চলেছে তাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ওই ব্যাপক সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতটাকে বিবেচনায় রেখে। কিন্তু এর মধ্যে এক বিশাল 'কিন্তু' নিহিত থাকছে আর তা হলো কুখ্যাত হেফাজতে ইসলামের দাবি মোতাবেক যেগুলো গতবারের পাট্যপুস্তকে বাদ দেয়া হয়েছিল নতুন করে সেগুলো সংযোজন করা হলেও যেগুলো গতবার ওই মহলের দাবি অনুযায়ী সংযোজন করা হয়েছিল সেগুলো কিন্তু এবারের নতুন বইতেও থেকে যাবে অক্ষত অবস্থায়। সেগুলোকে বাদ দেয়া হচ্ছে না বা এখন পর্যন্ত সেগুলো বাদ দেয়ার কথা সরকার ভাবছেনও না। তাহলে কি দাঁড়ায়? বাল্যকালে অনেকের কাছে যেমন শুনতাম, 'ডুডও খাব-তামাক খাব' সরকার এ ব্যাপারে যেন তেমন সিদ্ধান্তই নিতে চলেছেন। সরকারের হাল আমলের বিশ্বস্ত মিত্র হেফাজত ইসলামকে ও সন্তুষ্ট রাখা যাবে আবার গতবারের পরিবর্তনের কঠোর সমালোচক সকল দেশ প্রেমিক অসাম্প্রদায়িক মহলের মনের ক্ষোভও মেটানো যাবে।

একই ধরনের ঘটনা বর্তমান সরকার শুধু পাঠ্যবই-পাঠ্যসূচি নিয়ে করলেন বা করছেন তা নয়-দীর্ঘ দিনের অর্থাৎ বিগত ৭/৮টি বছর ধরেই এমন এক কৌশলর(?) রাজনীতি করেই চলেছেন তারা। যেমন তারা খুশি রাখতে চাইছেন দেশের ভয়াবহ উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী হেফাজতে ইসলামী জামায়াতে ইসলামী প্রমুখকে নানাভাবে তাদের প্রতিক্রিয়াশীল দাবি-দাওয়াগুলো মেনে নিতে-তেমনই আবার একই সঙ্গে কিছু কিছু কথা ও কাজের দ্বারা দেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষীয় ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক শক্তিগুলোও। লক্ষ্য হলো উভয় পক্ষের ভোট নিয়ে 'নৌকা'কে বা নৌকার বাক্স ভরে তোলা নির্বাচনের সময়ে। এখন তা আরও জোরদার হয়েছে সম্ভবত এই ভেবে যে তারা মনে করছেন আগ্রামী নির্বাচনে সকল রাজনৈতিক দলই অংশগ্রহণ করবে। ২০১৪ সালের প্রার্থী বিহীন, ভোটার বিহীন, নজিরবিহীন, প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিহীন, নির্বাচন এবারে আর হবে না। তথাকথিত কৌশলের স্পষ্ট নাম হলো আপস। চরম প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মান্ধ শক্তির সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের তথা বঙ্গবন্ধুর নীতি আদর্শের আপস। এমন আপসের কথা বঙ্গবন্ধু তারা

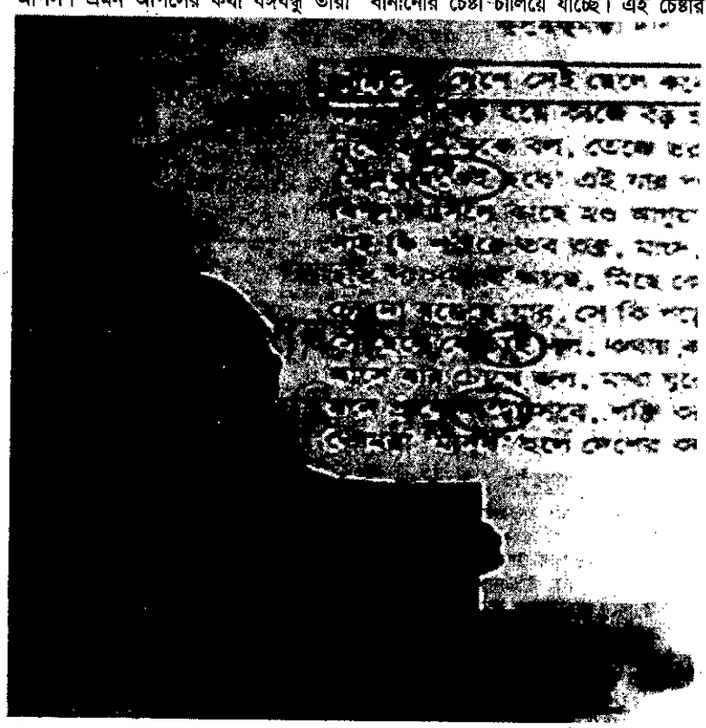

জীবদ্দশায় মুহূর্তের জন্যও ভাবতে পারেননি বা ভাবেননি। তার কাছে জীবনের সর্বাধিক মূল্যবান জিনিসটাই ছিল আদর্শ যার জন্য তিনি চরমতম ঝুঁকি নিয়ে দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে গড়তে ডাক দিয়েছিলেন 'যার যা আছে তাই-ই নিয়ে।'

সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আদর্শটি হলো ধর্মনিরপেক্ষতা যার জন্য পাকিস্তানকে সম্মিলিত কণ্ঠে 'না' বলে ৩০ লাখ বাঙালির জীবনের বিনিময়ে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের পতন করা বা প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য্য হয়ে পড়েছিল। আর ধর্মনিরপেক্ষতা ব্যতিরেকে গণতন্ত্র হতে পারে না জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্রও না। এখানেই ধর্মনিরপেক্ষতার সর্বাধিক তাৎপর্য ও গুরুত্ব। বাংলাদেশে স্বাধীনতা-বিরোধী দুটি ধর্মান্ধ দলের আচরণে খুব কি মৌলিক পার্থক্য আছে? জামায়াতে ইসলামী ও হেফাজতে ইসলামীর মধ্যে? একটি ১৯৭১-এ পাকিস্তান রক্ষা করতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সক্রিয় বিরোধিতা করতে গিয়ে লাখ লাখ মানুষ হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট প্রভৃতি করেছিল আর অপরটি অর্থাৎ হেফাজতে ইসলাম ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশকে পুনরায় পাকিস্তান বানানোর লক্ষ্যে ধর্মনিরপেক্ষতার চেতনাকে ধ্বংস করে পাকিস্তানি ভাবধারায় প্রসার ঘটানোর সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষানীতি বদলানো পাঠ্যপুস্তকে পরিবর্তন সাধান, নারী স্বাধীনতা ও নারী মুক্তির প্রতিরোধ, বাঙালি সংস্কৃতির বিরোধিতা করে তাকে অন্তঃসারশূন্য করার লক্ষ্যে হাইকোর্ট প্রাঙ্গণ, বিমানবন্দর এলাকা থেকে ভাস্কর্য অপসারণ ও শেষে দেশের সব ভাস্কর্য ভেঙে ফেলার দাবিতে কওমি মাদ্রাসা শিক্ষায় কোনভাবেই সরকারি হস্তক্ষেপ মানবে না বলে জানায়। আবার ওই শিক্ষার সর্বোচ্চ ডিগ্রিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্স ডিগ্রির সমতুল্য বলে ঘোষণা দিতে সরকারকে চাপ দেয় এবং সুকৌশলে তাতে সফলও হয়।

এভাবেই এবং আরও নানাবিধ উপায়ে তারা বাংলাদেশকে দ্বিতীয় পাকিস্তান বানানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই চেষ্টার অপর বহিঃপ্রকাশ ঘটে প্রগতিমনা চিন্তক-লেখকদের 'নাস্তিক' আখ্যায় আখ্যায়িত করে তাদের নিষ্ঠুরভাবে প্রকাশ্য রাস্তায় বা জনসমাবেশ এলাকায় ধারালো চাপাতি দিয়ে একের পর এক খুন করে। যেন আইন হাতে তুলে নেয়ার অধিকার তাদের আছে। এভাবে ইতোমধ্যেই বাংলাদেশের বেশ কিছুসংখ্যক শ্রেষ্ঠ সন্তানকে ওই পাকিস্তানপন্থি হেফাজতিদের বর্বরতার শিকার হতে হয়েছে এবং আমরা তাদের হারিয়েছি। বর্তমান সরকার মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সরকার বলে সর্বত্র পরিচিত বটে। আগেই বলেছি তাঁদের কতিপয় কথাও কাজ তার অনুকূলেও ঘটেছে কিন্তু ভোট প্রাপ্তির কৌশল বা ভোটবৃদ্ধির কৌশল হিসেবে যে সকল কাজ কয়েক বছর ধরে করে চলেছেন তাতে এই সরকার নিজেই নিজের মূল অহঙ্কারের জায়গা থেকে দ্রুত সরে এসে পাকিস্তানপন্থিদের অঘোষিত প্রশ্রয়দাতায় পরিণত হচ্ছেন। জাতিকেও ফেলছেন এক ভয়াবহ বিপর্য্যয়ের মুখে। আরও একটি দুঃখজনক অভিজ্ঞতা এই জাতিকে অর্জন করতে হচ্ছে।

জামায়াতে ইসলামীকে ও তার সঙ্গে সব ধর্মাশ্রয়ী দলকে নিষিদ্ধ করার বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে সরকার টালবাহানা করছেন। বহু আগে থেকেই তারা বলেছেন, জামায়াতে ইসলামকে দল হিসেবে বিচার করে শাস্তি হিসেবে তাকে আদালতের মাধ্যমে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার লক্ষ্যে আইন প্রণয়ন সম্পন্ন হয়েছে এবং তা শীঘ্রই মন্ত্রিসভার অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিসভা বৈঠকে পেশ করা হবে। মন্ত্রিসভা অনুমাদন দিলেই তা সংসদে উত্থাপন ও পাস করা হলেই সেই আইনে মামলাটি দায়ের করা হবে। এই কথা বলার পর আজ প্রায় দু'বছর অতিক্রান্ত হলো কিন্তু অগ্রগতি? প্রতি সোমবারে মন্ত্রিসভার বৈঠক যেহেতু অনুষ্ঠিত হয় তাই ওই উক্তির পর এযাবত কমপক্ষে ১০০টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে মন্ত্রিসভার। কিন্তু ওই আইন পাস হলো কি-না তা আর জানা গেল না। মাননীয় আইনমন্ত্রী এর কোন জবাব দেবেন কি? উক্তিটি তো আপনারই। এই বিষয়ে বহুবার লিখেছি অতীতে। কিন্তু তা যেন অরণ্যে রোদনে পরিণত হয়েছে। তবুও পুনরায় বলি, এ জাতীয় আদৌ কোন আইন বা মামলার প্রয়োজন নেই। একটি সংবিধান সংশোধনী আনুন। তাতে জামায়াতে ইসলামী, হেফাজতে ইসলামসহ সব ধর্মাশ্রয়ী দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করুন দল দুটির যাদের বিরুদ্ধে নাশকতা ও অপরাপর অভিযোগে মামলা দায়ের করা আছে সেগুলোকে সক্রিয় করে বিচার করে তাদের সবাইকে কঠোর শাস্তি প্রদান করুন। বঙ্গবন্ধু বাহাত্তরের সংবিধানে কোন মামলা না করে সংবিধানে এ জাতীয় বিধান সন্নিবেশিত করার মাধ্যমেই জামায়াতে ইসলামী ও ধর্মাশ্রয়ী দলগুলোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করছিলেন এবং সেই পথই হলো এ ব্যাপারে সর্বোত্তম পথ। আশা করি এই পথে আগামী ১৫ আগস্টের আগেই এ জাতীয় সংশোধনী এসে তা সংসদে অনুমোদন করা হবে জাতির দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা এবং সরকারের প্রতিশ্রুতি এভাবেই পূরণ করা হবে।

আবারও ফিরে আসি পাঠ্যপুস্তকের সম্ভাব্য পরিবর্তন প্রসঙ্গে। যত দ্রুত সম্ভব ওই পরিবর্তন তথা গত বছর যেগুলো বাদ দেয়া হয়েছিল সেগুলো সব যথাযথভাবে পুনঃসংযোজন এবং হেফাজতের দাবিতে সেগুলো গত বছর নতুন করে সংযোজন করা হয়েছিল সেগুলোকে এবার স্থায়ীভাবে বাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত অতি সত্বর ঘোষণা করুন। দ্বিতীয়তঃ কওমি মাদ্রাসাগুলোকে সার্বিকভাবে সরকারি আওতায় এনে তাতে বাংলা ও বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা প্রচলন করা হোক। তৃতীয়তঃ কওমির সর্বোচ্চ ডিগ্রিকে এখনই নয় যখন তারা সার্বিকভাবে সরকারি আওতায় এসে বাংলা ভাষা ও বিজ্ঞান সম্মত শিক্ষার্থীরা মাদ্রাসা শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর অতিক্রম করবে এবং পর্যালোচনা করে যদি দেখা যায় ওই শিক্ষা মাস্টার্স শিক্ষার প্রকৃতই সমতুল্যতা অর্জন করেছে তখন মাস্টার্স ডিগ্রির সমতুল্য বলে ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হোক;

চতুর্থতঃ অপসারিত সকল ভাস্কর্য যথাস্থানে অবিলম্বে পুনঃস্থাপন এবং নতুন নতুন ভাস্কর্য ও শিল্পকর্ম নানাবিধ প্রণোদনা ও ইতিহাসের স্মারক হিসেবে নির্মাণ ও দেশব্যাপী স্থাপন প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে অবিকল বাহাত্তরের সংবিধান পুনরুজ্জীবন কল্পে পঞ্চদশ সংশোধনীর সংশ্লিষ্ট অংশগুলোও বাতিল করা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সঞ্চারে অপরিহার্য

[লেখক : সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ঐক্য ন্যাপ]
raneshmaitra@gmail.com